শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক একমাত্র নিয়মিত পত্রিকা ● বর্ষ ২৬ ● সংখ্যা ৩ ● মার্চ ২০০৭

অগ্রযাত্রার দু' যুগ

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

নিবন্ধ

মানব-সম্পদ উন্নয়নে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ড. এম আজিজুর রহমান, ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

মানব-সম্পদ

মানব-সম্পদ হলো সুশিক্ষিত ও কার্যক্ষম জনগোষ্ঠি। প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানব জাতির জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিকাশ, আনন্দ-অনুভূতি, আগ্রহ তথা মানসিক দিকের বিকাশ এবং দেহতত্ত্বের সুষম বিকাশের মাধ্যমে এই সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। কেননা শিক্ষা সভ্যতার উপকরণ, মানুষের মানবিক বিকাশ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের সুখ সমৃদ্ধির স্বপ্ন পূরণ কিংবা সমস্যা মোকাবিলা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের সামর্থ্য যোগায় (সেটি ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত যে দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন)। তাই মানব-সম্পদ উন্নয়ন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

কোন দেশের জাতীয় আয় যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি দেশের মানুষের গুণগতমানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজ ও অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সক্রিয়তা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যে বিনিয়োগ করা হয় তার সবটুকুই বস্তু-সম্পদ নয়, মানব-সম্পদও তার একটি বড় অংশ। কার্ল মার্কস মানুষকে তাই 'মানবীয় মূলধন' হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মানব-সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি মূলত ব্যক্তির সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ, ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তন এবং ব্যক্তির মধ্যে কর্মমুখী প্রেষণা সঞ্চার করে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে এসব দিকের পরিবর্তন আনতে পারে শিক্ষা। তাই মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাই প্রধান।

সুষম বন্টন

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অর্থ-সম্পদ অর্জন ও মূলধনের সুষম বন্টন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ মানব-সম্পদের সুষম বন্টন। মানব-সম্পদকে সমাজের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন এবং যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা একমাত্র সুষম বন্টন এই সম্পদকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। সুষম বন্টনের তত্ত্ব হলো ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। মানুষের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গ্রহণ করার ক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমান নয়। তাই বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে খরচ বহনের দায়-দায়িত্ব ধনী ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের সমান হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। এতে করে মেধাবী গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ হারাবে; অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বহনে অপারগতার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হবে। তাই শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অবাধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য মানব-সম্পদের সুষম বন্টন একান্ত আবশ্যক।

দেশে প্রায় দুই ডজন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং অর্ধশতেরও বেশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যাচ্ছে শুধু আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। অনেক গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা অর্থ সংকটের কারণে পাবলিক পরীক্ষায় ভাল প্রস্তুতি ও ফলাফল করতে না পেরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ঢুকতে পারছে না।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত আসনের কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই শূন্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও অবাধ সুযোগ সৃষ্টিকল্পে এবং উচ্চ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্যে অত্যন্ত আধুনিক এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে টিচিং এইডস বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অর্জিত অর্থ-সম্পদ ও মূলধনের সুষম বন্টন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে সম্পদ অর্জন করি তা মানব-সম্পদ। দারিদ্র্য পীড়িত এদেশের সার্বিক উন্নয়নে মানব-সম্পদের সুষম বন্টন প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বরকমের গরিব-ধনী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অবাধ সুযোগ প্রদান করতে পারলে মানব-সম্পদের সুষম বন্টনের কাজটি অনেকাংশেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়লেই দেশটিকে সুউন্নত দেশ বলা যায় না যদি সেখানে সম্পদ ও মানব-সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না হয়। অর্জিত অর্থ-সম্পদ ও মূলধনের মতো পড়ালেখা ও বিদ্যার্জনের মাধ্যমে মানব-সম্পদ তৈরি হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে এই সুশিক্ষিত মানব-সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দায়-দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ দায়িত্ব হলো মানব-সম্পদ তৈরি ও এর সুষম বন্টন।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় করদাতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ প্রদত্ত অর্থে। এছাড়াও গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন হচ্ছে। কাজেই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে করদাতাদের মানব-সম্পদের সুষম বন্টনের মৌলিক কিছু দাবি থাকলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কারও এ ধরনের দাবির সুযোগ সীমিত। তথাপি মানবিক কারণে ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের পাশা-পাশি গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে শিক্ষা ও মানব-সম্পদের সুষম বন্টন ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করে চলেছে।

বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় বিনা বেতনে পড়ানোর বা বৃত্তি প্রদানের যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাতে ধনী-গরিব বিচার-বিবেচনা করা হয় না। যার ফলশ্রুতিতে মানব-সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হচ্ছে না। একথা সত্য যে, সব মেধাবী শিক্ষার্থীই গরিব নয়। আগে দেখা যেত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের যেমন স্কুল শিক্ষক ও পোস্ট মাস্টারের ছেলে-মেয়ে বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। এখন যে সব ছেলে-মেয়ের, বাবা-মা পড়ালেখার পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছে অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের গৃহ শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের সহায়তা দিতে পারছে, সে সব ছেলে-মেয়েই পরীক্ষায় ভাল ফল করছে। অপর দিকে দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানেরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ সুযোগের অভাবে অনেকেই ভাল ফল অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না, যার ফলে সত্যিকারের মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। ছাত্র ভর্তির

সময় বাবা-মায়ের আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো যাচাই বাছাই করে শুধু সত্যিকারের মেধাবী তথা গরিব শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার-সুযোগ দিলে মানব-সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা যাবে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে পারলে একটি দেশের মেরুদণ্ড যে সুদৃঢ় হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে একসাথে শিক্ষার সব স্তরের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হলো পর্যায়ক্রমে শিক্ষার স্তরসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং এক্ষেত্রে প্রথমেই নজরদারী দৃঢ় করা দরকার প্রাথমিক শিক্ষার দিকে। প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিপুষ্ট করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এমন যে, সরকার নানাবিধ প্রতিকূলতায় সব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করতে পারছে না, অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন দিতে পারছে না, চাকরি নিয়মিত করতে পারছে না, যার প্রেক্ষিতে আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে অনশন কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হয়েছে। একটি জাতির মেরুদণ্ড তৈরির প্রাথমিক ভিতের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই জাতির ভবিষ্যতকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার অশনীসংকেত বহন করে। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত বিপরীত চিত্র ধারণ করছে। সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের চাহিদা পরিপূরণের পর তা বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণের পর যদি সরকার এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা জাতির জন্য যথার্থ কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি।

মানসম্পন্ন শিক্ষা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের প্রায় দু'ডজন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট মিলে বছরে শত শত কোটি টাকা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে বরাদ্দ করতে হয়। এই অর্থ আসে দেশের সাধারণ মানুষের কর প্রদানের অর্থ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই কর প্রদানকারী জনগণের কিছু দাবি দাওয়াও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থাকতে পারে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন এমনভাবে করা উচিত যাতে জনাকীর্ণ এই বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটগণ যে কোন দেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান উপেক্ষা না করে আবেদন করতে পারে। বহির্বিশ্বে নিয়োগকারী সংস্থাগুলো যদি আমাদের দেশের গ্র্যাজুয়েটদের সার্টিফিকেট ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে সাদরে গ্রহণ করে তবেই বিদেশে চাকরিরত বাংলাদেশীদের কাছ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় আরো বাড়বে। বর্তমানে বহির্বিশ্বে চাকরিরত অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক থেকে দেশে রেমিটেন্স আসছে। ভবিষ্যতে দক্ষ ও শিক্ষিত জনসম্পদ থেকে রেমিটেন্স প্রাপ্তি যাতে সুনিশ্চিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

কর প্রদানকারী নাগরিক হিসেবে আমাদের আরও প্রত্যাশা থাকবে যে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নয়ন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করুক, জাতিকে উন্নয়ন গবেষণার মডেল উপহার দিক, যার ভিত্তিতে এ দেশ আরও উন্নতি করতে সক্ষম হবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে প্রায় অর্ধশতাধিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনীতিবিদদের সুচিন্তিত নীতি-নির্ধারণের ফসল ১৯৯২ সালে প্রণীত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভিন্নভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন রকম আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে হলো আধুনিক ইন্টারনেট যুক্ত কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।

সুযোগ্য শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রদানের ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাদের গবেষণার উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি জার্নালে তাদের গবেষণা ছাপা হচ্ছে, ছাত্ররা এসব গবেষণায় অংশগ্রহণ করছে। ফলে শিক্ষার মান বাড়ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব সুযোগ্য শিক্ষক আছেন তারা বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ও পিএইচডি গাইড করে থাকেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বেশি সম্পদ থাকার ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দেশি-বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পকালীন শিক্ষার জন্যে পাঠানো সম্ভব। অনেক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে এরূপ ছাত্র-ছাত্রী এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্যে শিক্ষার বিভিন্ন লেভেলে সহায়তা করছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন দেশে স্কলারশীপ দিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানো হচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আছে। তাদের অনেকেই দরিদ্র। এ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কমনওয়েলথ স্কলারশীপ দেয়া হলে তা মানব-সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।

বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বেশ ভাল চাকরি পাচ্ছে। এ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎপাদনশীলতা অনেক ভাল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এসব চাকরি পেয়ে ভাল বেতন পাচ্ছে। ফলে সমাজে আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতীয় কল্যাণে নানবিধ অবদান রেখে চলেছে। যেমন-

বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পড়ালেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশ যাওয়ার হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে, যার ফলে শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে চাপ হ্রাস

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলে- মেয়েরা আগে শুধু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখা করত, যার ফলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর ছাত্র ভর্তির খুবই চাপ বিদ্যমান ছিল। সেই চাপ আজ অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে। মানব-সম্পদের সুষম বন্টন ত্বরান্বিতকরণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটি স্বয়ংক্রিয় মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে ও বৃত্তি প্রদান করে বছরে গড়ে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার অধিক অর্থ গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্বার্থে যোগান দিচ্ছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন দেশের জন্যে একটি গ্রহণযোগ্য মডেল। আমাদের সংস্কৃতিতে এই ধারণাটি নতুন বিধায় বাংলাদেশে এই মডেলের গ্রহণযোগ্যতা পেতে কিছুটা সময় লাগছে। অদূর ভবিষ্যতে এই মডেলটি অন্যান্য দেশের মত গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে কিছুদিন পূর্বেও সমালোচকদের কটূক্তি লক্ষ্য করা গেছে এবং এ বিষয়টি আমাদের দেশে একটি নেতিবাচক সংস্কৃতির সূচনা করেছিল। ইদানিং এই নেতিবাচক সংস্কৃতির চর্চা

ইতিবাচকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ সুনাম অর্জন করছে। বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ চিরন্তন। প্রাক ব্রিটিশ আমলে দেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। পরবর্তীতে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে শ্রেণী ও স্তরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সময় ও সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা এখন অনেকটাই আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আধুনিক জগতে প্রায়োগিক ও যুগোপযোগী নতুন নতুন শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব পর্যায়ে অভিজ্ঞাতাসম্পন্ন শিক্ষকদের গড়ে প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা বেতন দিচ্ছে, যার ফলে অনেক শিক্ষকই অর্থ উপার্জনে বিদেশ গমনের চিন্তা করছেন না। এমন কি অনেকেই সরকারী চাকরি ছেড়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছেন। এ ধরনের শিক্ষকদের বেশিরভাগ শিক্ষক বিদেশের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে এসেছেন। এসব শিক্ষক ভালো শিক্ষাদান করতে পারেন না এই ধারণা পোষণ করার কোন সুযোগ নেই।

শিক্ষার্থীদের পাঠের সুযোগ সৃষ্টি

মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে একজন শিক্ষার্থীর স্বনির্ভর পাঠদক্ষতা, গুছিয়ে কথা বলা ও লেখার দক্ষতা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের এসব অভ্যাস গঠনে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একজন শিক্ষার্থীকে গড়ে প্রতি ২ সপ্তাহে একটি করে লিখিত পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে একজন ছাত্রকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রি অর্জন করতে কমপক্ষে ১০০ বার লিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই একজন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি অর্জন করতে হলে অবশ্যই ন্যূনতম পড়ালেখা করতে হয় বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শেষকথা হলো নিয়োগকারী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শুধু সার্টিফিকেট দেখে চাকরি দেয় না। চাকরির জন্যে ছাত্রদের বি সি এস পরীক্ষা থেকে শুরু করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতগুলো পরীক্ষার পর একজন ছাত্রের চাকরি নিশ্চিত হয়। মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমালোচকদের প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। আশা করি, গঠনমূলক সমালোচনা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশ করা হলে সমাজ তথা দেশের শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সার্বিকভাবে মানব-সম্পদ উন্নয়নে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন রকম পেশাগত শিক্ষায় বিশেষ করে ব্যবসা প্রশাসন, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংরেজি, জার্নালিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অবদান ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ দেশি-বিদেশি দক্ষ শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষিত মানব-সম্পদের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে।